কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধান মেনে চলতে বাধ্য করা, অন্যায় করলে নিশ্চিত শাস্তির বিধান কার্যকর করার পাশাপাশি নিয়োগ-পদোন্নতির বেলায় স্ব স্ব প্রাতিষ্ঠানিক বা একাডেমিক দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার সংস্কৃতি চালু করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তার কতটুকু দেখি? রাজনৈতিক প্রভাব কাটিয়ে চাকরি, প্রমোশন, পোস্টিং ইত্যাদির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বা আসতে বাধ্য করতে হবে সবাইকে। একই সঙ্গে পরিচালনা কমিটি বা সিন্ডিকেটকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে উপাচার্যরা কোনো প্রকার প্রভাব বা ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন

ড. আবদুল্লাহ ইকবাল

পাবলিক ভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষার যৌক্তিকতা

অতি সম্প্রতি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে তাঁদের নিয়োগ চূড়ান্ত করার আগেই পুলিশ ও গোয়েন্দা ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করতে হবে। এই নতুন নির্দেশনা দেওয়ার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, ইদানীং বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগে নানা জটিলতা দেখা যাচ্ছে। এসব অনভিপ্রেত অবস্থার সমাধানকল্পে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া গোয়েন্দা বিভাগের গোপন প্রতিবেদনে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে এই দুটি সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথমেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে ইচ্ছা বা অভিলাষ পোষণ করা হয়, তা বাস্তবায়ন হবেই। তবু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কিছু বিষয় এখানে শেয়ার করছি।

এটি নিশ্চয়ই সবার জানা আছে যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে গুরুত্ব দেওয়া হয় বিগত পরীক্ষাগুলোর ফলাফলকে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীর সর্বশেষ ডিগ্রির ফলাফলকে (সহজ কথায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে)। এটি মনে হয় কেউই অস্বীকার করবে না যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগেরই সর্বোচ্চ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জীবনের স্বপ্নই থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)। অন্যদিকে প্রতিটি বিভাগেরই সুপ্ত ইচ্ছা থাকে সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীটিকে তাঁদের ভবিষ্যৎ সহকর্মী হিসেবে পাওয়ার। এর মূল কারণ সম্ভবত নিয়োগদানকারীরা ধরেই নেন যে, যে শিক্ষার্থীটি চার-পাঁচ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে লিখিত, মৌখিক, টিউটরিয়াল, সেশনাল বা অনুরূপ সব মিলিয়ে শতাধিক পরীক্ষায় (যেগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকেন অসংখ্য শিক্ষক। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে বা সাবজেক্ট অনুযায়ী এই সংখ্যার তারতম্য হতে পারে) যোগ্যতা বা মেধার স্বাক্ষর রাখে তাঁর বা তাঁদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধু 'ফলাফল'ই হতে পারে সর্বোচ্চ মানদণ্ড বা মাপকাঠি। আসলেও আমরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরাও তাই মনে করি বা করেন (কিছু ব্যতিক্রম থাকাটা অস্বাভাবিক নয়)। যে শিক্ষার্থীটির বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বেশি আছে বলে আপাতত প্রতীয়মান হয় তাঁর কাছ থেকেই ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীরা ভালো কিছু শিখতে বা জানতে পারবে বলেই সবার বিশ্বাস। আর সে জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ শুধু মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ যদি এখন মনে করেন যে এতে মেধাবীরা বঞ্চিত হয় বা অনিয়মের সুযোগ থাকে, তাহলে সেটি থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে লিখিত পরীক্ষার বিধান চালু করার আগে এটির যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা বিবেচনা করা জরুরি।

লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে যেসব স্তরে শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে সেগুলোর দিকে তাকালে বিষয়টি অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মেধার ভিত্তিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ বা মাদ্রাসা পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য তো লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সেই স্তরগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে যত জটিলতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি হয় (যা বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে) সেটি মনে হয় আঁচ করতে কারো কষ্ট হয় না। অনেক পদক্ষেপ নিলেও এসব ক্ষেত্রে খুব বেশি সফলতা এসেছে, সেটি মনে হয় বলা যাবে না। তার পরও হঠাৎ করেই কেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য শিক্ষক নিয়োগে এই সুপারিশ? নাকি এর পেছনে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র আছে, সেটিও প্রধানমন্ত্রীসহ সব কর্তাব্যক্তিকে আমলে নিতে হবে। পাশাপাশি এটিও চিন্তা করতে হবে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বা 'স্ট্যান্ডার্ড' এক নয়। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান, গুণী শিক্ষক, গবেষণার সুযোগ ইত্যাদি পর্যাপ্ত না হলেও তুলনামূলকভাবে বেশি। সে তুলনায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছু নেই বললেই চলে। তাহলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলবে কেমন করে বা ভবিষ্যতে দাঁড়াবে কেমন করে সে চিন্তাটুকুও বিবেচনায় আনতে হবে। অন্যথায় আজ লিখিত পরীক্ষার বিধান চালু করা, পরবর্তী সময়ে অধিকতর স্বচ্ছতার নামে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে একজন আমলা বা রাজনৈতিক ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকার বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে। যার ফলে নিয়োগপ্রক্রিয়াটি ভবিষ্যতে আরো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। যেটি বর্তমানে আমরা দেখছি স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষক নিয়োগের বেলায়। বরং সেটি না করে ইউজিসির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে যেন সর্বোচ্চ ফলাফলধারীদের মধ্য থেকে 'টপ ৫ শতাংশ' বা আরো কঠোর ও মানসম্মত করতে চাইলে 'টপ ৩ শতাংশ'কে নিয়োগ দিতে হবে। আর এই 'টপ ৫ শতাংশ' বা 'টপ ৩ শতাংশ'-এর ভেতরে যদি দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে দু-একজন সরকারবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থেকেই থাকেন, তাতে সরকারের খুব বেশি আসবে-যাবে বলে মনে হয় না। এক যুগের অধিক সময়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকে যা দেখেছি, 'টপ ৫ শতাংশ' বা 'টপ ৩ শতাংশ' ফলাফলধারীরা পড়ালেখা ছাড়া আসলে কিছুই বোঝেন না! তাঁরা অনেকটাই 'বই পোকার' মতো। সরকার বা দেশের ক্ষতি নিয়ে চিন্তা করা তাঁদের আসলে মাথায়ই আসে না।

এবার আসা যাক পরবর্তী নির্দেশনার বিষয়টিতে—নিয়োগের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের আগে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করতে হবে। আসলে এ পর্যন্ত চালু ছিল নিয়োগের পরে পুলিশ ভেরিফিকেশন বা গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ব্যক্তিগত তথ্যাদি যাচাই করার বিধান। বর্তমানে প্রচলিত পুলিশ ভেরিফিকেশনের সময় কি ঘটে তা সাম্প্রতিক বা যেকোনো সময়ে নিয়োগপ্রাপ্তদের সঙ্গে কথা বললেই বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে। এখন নতুন করে এই বিধান চালু করলে হয়রানির মাত্রা বাড়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। এতে স্বার্থান্বেষী ও দুর্নীতিবাজ কিছু লোক আরো বেশি মরিয়া হয়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে আরো বরং কার্যকর হতে পারে যে, যে বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকপ্রার্থীরা পড়াশোনা করেছেন সেখানকার প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দেওয়া। নইলে পুলিশ ভেরিফিকেশন বা গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ব্যক্তিগত তথ্যাদি যাচাইয়ের নামে শিক্ষকপ্রার্থীর ওপর রাজনৈতিক নেতা কিংবা পুলিশ বাহিনীর হস্তক্ষেপ বা প্রভাব পড়তে পারে। আর এই দুই সুপারিশের আলোকে সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তি বা অপরাধীরা নিয়োগের সুযোগ পাবে না—এটি নিশ্চিত করা যাবে না। এটি নিশ্চিত করার জন্য বরং প্রাতিষ্ঠানিক বিধিবিধান মেনে চলতে বাধ্য করা, অন্যায় করলে নিশ্চিত শাস্তির বিধান কার্যকর করার পাশাপাশি নিয়োগ-পদোন্নতির বেলায় স্ব স্ব প্রাতিষ্ঠানিক বা একাডেমিক দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়ার সংস্কৃতি চালু করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তার কতটুকু দেখি? রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে চাকরি, প্রমোশন, পোস্টিং ইত্যাদির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বা আসতে বাধ্য করতে হবে সবাইকে। একই সঙ্গে পরিচালনা কমিটি বা সিন্ডিকেটকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে উপাচার্যরা কোনো প্রকার প্রভাব বা ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও পাবে মেধাবী শিক্ষক।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
Eiqbal21155@bau.edu.bd